Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – I, Issue-III, published on July 2021, Page No. 1 –8
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

ধ্রুপদী লোকনাট্যে না নারী, না পুরুষ, না কিম্‌পুরুষ মানুষের উপস্থাপন : মায়ামৃদঙ্গ (১৯৭২)

অন্বেষা বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Keyword
বাংলা কথাসাহিত্যিক, মায়ামৃদঙ্গ, পুরুষ, আলকাপ, ছোকরা, চণ্ডীদাসী প্রেম

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এক উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল ১৯৭২ সালে। লেখক নিজেই বলেছেন, "আমার এ বই উপন্যাস এবং মূলয় অর্ধনারীশ্বর বিষয়ক, তত্রাচ অকপটে প্রকৃত তথ্যজ্ঞাপক।" [১] এ উপন্যাসে এক 'বিরল মায়া'-র কথা প্রায় সবিস্তারে বিন্যস্ত। এই 'বিরল মায়া' হল আলকাপ' দলের নায়িকা 'ছোকরা'। ১৯৬০-৬১ সালে লোকসংস্কৃতি জগত থেকে মুছে যাওয়া এই লোকনাট্যের আঙ্গিকটি পদ্মা-গঙ্গা-অজয়-ময়ূরাক্ষীর এপারওপার যোজনবিস্তৃত অববাহিকায় গ্রামগঞ্জে হাট, মেলায়, উৎসবে-নিরুৎসবে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। লেখকের বয়ানে, "এই অত্যাশ্চর্য এবং ধ্রুপদী লোকনাট্যরীতির জনপ্রিয়তা লোকসমাজে শ্রেষ্ঠতম। আবার বলছি শ্রেষ্ঠতম।" [২] 'আলকাপ' কথাটির প্রকৃত অর্থ- আমোদপ্রমোদমূলক নাটিকা। তবে কথাটির অর্থব্যঞ্জনা (Conotation) বিস্তারে এই অর্থও ব্যক্ত- 'রঙ্গরসাত্মক নাটিকা' বা 'রঙ্গব্যাঙ্গাত্মক নাটিকা'।[৩] "আলকাপ'- এর পটভূমিতে লেখা 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসের"[৪] দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন, উপন্যাসটি "একাধারে আত্মজৈবনিক ও ডকুমেন্টারি।"[৫] লেখক প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতে জানিয়েছেন, "তত্রাচ অকপটে প্রকৃত তথ্যজ্ঞাপক!" অর্থাৎ এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভারতের গ্রামবাংলায় 'আলকাপ' দলের অস্তিত্ব ছিল সাড়ম্বরে এবং সেখানে 'এক বিরল মায়া' ও ছিল। আর সে বিরল মায়া হল 'নাচিয়ে ছোকরা'। যারা মূলত ছিল 'অর্ধনারীশ্বর', অর্থাৎ না নারী, না পুরুষ, না কিম্ পুরুষ- 'সে এক অমর্ত্য মায়া'। ছোকরা সম্বন্ধে ওস্তাদ ঝাঁকসার স্পষ্ট মন্তব্য, "রাত্রির শোভা চাঁদ আর আলকাপের শোভা এই ছোকরা। পুরুষ- তবু পুরুষ নয়, নারী-তবু নারীও না।"[৬] ছোকরারা জৈবিক লিঙ্গ বা জন্মগত যৌনচিহ্নে পুরুষ। কিন্তু সামাজিক লিঙ্গ বা সমাজ নির্ধারিত পোষাক পরিচ্ছদ, চলন, বলন, আচরণে নারী। ছোকরার এই সামাজিক লিঙ্গ তার ব্যক্তিগত ইচ্ছানির্ভর নয়। 'আলকাপ' দলের ওস্তাদ নিজ হাতে একটু একটু করে গড়ে তোলেন এদের। দলে নাচ, গানের জন্য প্রয়োজন হয় নারীর। কিন্তু দলের আর পাঁচ-সাতজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর সর্বত্রগমন ও সর্বদা অবস্থানগ্রহণ সম্ভব নয় বলেই দলে নারী রাখা হয় না। নারী তৈরি করা হয় একজন পুরুষকে। আচরণে সে

নারী, কিন্তু শরীরে সে পুরুষ। অন্যান্য পুরুষের চোখে মায়ার মতো ঠেকে তাকে। এ এক অধরা মায়া। ধরতে গেলে দেয় না ধরা। রক্তমাংসের নারীর চেয়ে এদের দর অনেক বেশি আলকাপের দলে।

পরবর্তীকালে নানা সমস্যার কারণে আলকাপে নারীই আনা হয়। কিন্তু তারা 'বিরল মায়া' তৈরিতে ব্যর্থ হয়। তারপর একদিন শেষ হয়ে যায় আলকাপ দল। আলকাপ দলের পুরুষরা ছোকরার সাহচর্য ভালোবাসে। তার সঙ্গ পাওয়া, না পাওয়া নিয়ে দলের সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। ছোকরাই সব মানিয়ে নিয়ে টিকিয়ে রাখে দলটা। কিন্তু মনে মনে সে ওস্তাদকেই বেশি ভালোবাসে। ওস্তাদও ভালোবাসে তার শিষ্যকে। কিন্তু সমাজ মানতে চায় না এসব। পুরুষকে নারী সাজিয়ে গানের দল চালানো মহাপাপ বলে গণ্য। দলের পুরুষদের স্ত্রীরা বা তাদের নারী সঙ্গীরা ছোকরাকে 'সতীন' ভাবে। তার অবশ্য একটাই কারণ। দলের পুরুষেরা ছোকরাকে নিয়ে রাতে শুয়ে থাকে, বাড়ি ফেরে না। তাদের বউ অভিশাপ দেয়, গাল দেয় ছোকরাকে। শত অপমান সহ্য করেও দলের স্বার্থে ছোকরা তা ছাড়তে নারাজ। কিন্তু কালের নিয়মে ছোকরাকে একদিন প্রতারণা করে তার যৌবন। বয়স বেড়ে যায়। গলার স্বর বদলায়। শরীরের জোর কমে আসে। সংসারে নতুন কাজ সে শেখেনি। সমাজ তাকে গ্রহণ করে না। শেষনিশ্বাস পর্যন্ত সে দলে টিকে থাকার লড়াই করে যায়। তার এই সংগ্রাম শুধুমাত্র শিল্পের জন্য নয়, শুধুমাত্র অর্থের জন্য নয়-এ লড়াই বেঁচে থাকার লড়াই, অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম। পুরুষ যাকে নারী ভাবে, আর নারী যাকে পুরুষ ভাবে, সে নিজেকে কী ভাবে, সে কী চায়, তা জানতে চায় না সমাজ, দলের অন্য সদস্যরা। তবু শিল্পকে ভালোবেসে নিজেকে ভালোবেসে আমরণ লড়াই করে বাঁচে এই না-নারী, না-পুরুষ, না কিমপুরুষের দল ।

ছোকরার জন্ম কোথায়, কোন পরিবারে, তা কোনও গুরুত্ব পায় না। ছোকরার জীবন সার্থক হয়ে ওঠে সার্থক ছোকরা হওয়ার পর। শুধু সুন্দর দেখতে হলেই ছোকরা হয় না। নাচে, গানে, বোধে- সবদিক থেকে শ্রেষ্ঠ হলে তবেই সে 'ছোকরা'র মর্যাদা পায়। তারপর একদিন রূপে, গুণে গুণবতী হয়ে রসের আসর মাতাতে পারলে তার জীবন সার্থক হয়। ওস্তাদ বা দলের যে কেউ বা শ্রোতারা নিজেদের জাতপাত ভুলে ছোকরাকে ভালোবাসতে শুরু করে। তার হাতের খাবার খায়, তার সঙ্গ চায়, তার পাশে শুতে চায়। শুধুমাত্র নিজের শিল্পগুণে ছোকরা সমাজের বর্ণবিদ্বেষ মুছে দিতে পারে। তার কাছে সবাই সমান। তবে 'ছোকরা' হয়ে ওঠার সাধনা বড়ই কঠিন। ওস্তাদ ঝাঁকসার কথায়, "এ নামতা ভুলো না-চলনে বলনে শয়নে স্বপনে তুমি নারী-সর্বদা নারী তুমি ভাবনায়, ইচ্ছায়, আহারে-বিহারে। তবে না আলকাপের সার্থক ছোকরার জন্ম।"[৭]

তারপর সার্থক ছোকরা হয়ে গেলে সে পায় ওস্তাদের আদর, শিল্পীর সম্মান। যেমন ছোকরা শান্তিকে ওস্তাদ ঝাঁকসা বলেছিল, "তুই ব্যাটা বাগদী সন্তান-আমাপেক্ষা জাতে নীচ, তথাপি ইচ্ছে করে তোর এঁটো খাই।"[৮] শুধু এঁটো নয়, ছোকরাত চুমু খাওয়ার জন্যই দলের অন্য সদস্যদের মধ্যে সর্বদা প্রতিযোগিতা চলে। ছোকরার সঙ্গ কিন্তু ভালো লাগে দলের পুরুষ সদস্যদের স্ত্রীদের। তারা বলে, "তোমার লজ্জা করে না মেয়ে সাজতে?" অথবা, ওস্তাদ কোনদিন বলে, "কেন তোদের জন্ম হয়েছিল রে গিদধড়ের বাচ্চারা!"[৯] তবুও দল ছাড়তে চায় না এই এই অপমানিত, লাঞ্ছিত, প্রতারিত নারীসুলভ অমানবীরা। তারা সজোরে বলে, "সে কি গো! তাহলে ওস্তাদের যে দল অচল হয়ে যাবে।"[১০] ছোকরাদের বিয়ে করে না কেউ। একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত পুরুষের ভালোবাসা পায় তারা। তারা ঘর বাঁধতে চায়। তারা জানে স্বামী সন্তানের সংসার তাদের জন্য নয়। তাই তারা দল বাঁধতে চায়। গান গাইতে চায়। বলে, "ঘর বাঁধব না, দল বাঁধব।...গান ছাড়া আর করব কী বলুন! মরে যাবো না?"[১১] ছোকরার সাধনার বস্তু হয়ে ওঠে গান। সে তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা করে। কল্পনাশক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করে। কেন না কালাখুড়োর কথা ভোলা যায় না। "কালাখুড়ো ভুলতে পারে না পিছনটাকে। পিছনের নটির স্মৃতি ওকে উত্যক্ত করে।"[১২] কালাখুড়োরা যৌবনে ছোকরা ছিল। এখন চুল কেটে বৃদ্ধ বয়সের ভারে অবনত, ক্ষয়ে যাওয়া মানুষ সে। অতীতের স্মৃতি আর অভিজ্ঞতা তার একমাত্র সম্বল। সে অকপটে

সাবধান করে দেয় নবীন ছোকরাদের। বলে, "সাবধান। ওরা তোমার মজা লুটিয়েরা। চুষে ছিবড়ে হলেই ফেলে দেবে। তাকিয়েও দেখবে না।" কালাখুড়োর এই সাবধানতা আপন অভিজ্ঞতালব্ধ। তাই তা অগ্রাহ্য করার সাহস নেই নবীন ছোকরার। ছোকরার জীবন শুধুমাত্র জৈবিক লিঙ্গ ও সামাজিক লিঙ্গের অসামঞ্জস্যতার উদাহরণ নয়। তা যৌন ব্যাভিচারের গল্পও বলে আমাদের। ছোকরা সেখানে শুধু শিল্পী নয়, সে একজন রক্তমাংসের মানুষ। সে মনে মনে মানবী, সে প্রতিবাদের অস্ত্র হিসাবে গলায় তুলে নেয় গানকে। গানের মাধ্যমে সে শুধু স্রোতার মন জয় করে না, সে ওস্তাদের মনও জয় করে। সার্থক ছোকরা শত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তবে বার্ধক্যে পৌঁছায়, সেখানে পৌঁছেও সে স্বপ্ন দেখতে ভোলে না। পূর্বজীবনের অপমান, আঘাত সব ভুলে সে গানের জগতে কাঙ্ক্ষিত শান্তিলাভের প্রার্থী হয়ে ওঠে। আর গান হয় তার সাধনা। আলকাপ দলের মূল আকর্ষণ হয়ে ছোকরা তার লিঙ্গচেতনা ভুলে তার শিল্পসত্তাকেই প্রধান হাতিয়ার করে তোলে এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়। বিষমকামী সম্পর্কের বিরুদ্ধে তাদের সমকামিতার আখ্যান দুর্লভ হলেও বাস্তব।

'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসের গল্পটি সংক্ষেপে এরকম-'আলকাপ' দলের বিখ্যাত ওস্তাদ ধনপতনগরের ঝাঁকসুর ছোকরা শান্তি দল ছেড়ে পালায়। ওস্তাদ তবু গান ছাড়ে না। সে নানা জায়গায় গান শোনানোর বায়না পায়। চণ্ডীতলা নামে এক জায়গায় গান শোনাতে গিয়ে জানতে পারে, সেখানে শান্তিচরণ আছে। শান্তিচরণকে ওস্তাদের লোকজন তুলে আনে। ওস্তাদ তাকে নানা প্রশ্ন করে জানতে চায়, সে কেন দল ছেড়ে পালিয়েছিল। শান্তি সেসব কথা বলার পর ওস্তাদ ঝাঁকসু জানায় যে সে আর গান গাইবে না। পরে অবশ্য ওস্তাদ ঝাঁকসু তার নিজের ছেলেকে ছোকরা বানাতে চায়। কেন না, ছোকরার অভাবে দল চালানো বড় দুঃসাধ্য। আলকাপ দলের আরেকজন ওস্তাদ হল সাঁওতাপাড়ার সনাতন ওস্তাদ। তার দলের ছোকরা হল সুবর্ণ। সুবর্ণ আর সনাতন এক সময় ওস্তাদ ঝাঁকসুর প্রতিপক্ষ হয়ে আলকাপে লড়েছিল। তারপর তারা ঝাঁকসুর সঙ্গে কাজ করেছিল কিছুদিন। তারপর একসময় সুবর্ণ আর সনাতন সাঁওতাপাড়ার দল ছেড়ে ওস্তাদ ঝাঁকসুর দলে যোগ দেয়। এখানেই শেষ হয় কাহিনী।

কাহিনীর ভিতরেও কাহিনী থাকে। উপন্যাসের শুরু হয় একটি মৃত্যু দিয়ে আর শেষও হয় আরেকটি মৃত্যু দিয়ে। প্রথমটি আত্মহত্যা, আর দ্বিতীয়টি খুন বা হত্যা। যারা নিজে মারা গেল বা অন্যের দ্বারা মারা গেল, তারা দু'জনেই ছিল নারী। একজন ওস্তাদ ঝাঁকসুর ছোট স্ত্রী গঙ্গামণি। অপরজন সনাতন মাস্টারের প্রেমিকা সুধা। এই দু'জনের মিল শুধু নারীর সামাজিক বা জৈবিক লিঙ্গে নয়, মনেও, অর্থাৎ তাদের মিল যৌনতার বোধের ক্ষেত্রেও। তারা ভালোবেসেছিল তাদের স্বামী বা প্রেমিকাকে। যারা জৈবিক ও সামাজিক লিঙ্গে পুরুষ। নারীর এই পুরুষের প্রতি আকর্ষণ ও অন্তরঙ্গতার আকাঙ্ক্ষা সমাজ নির্ধারিত বা প্রথাগত যৌনতার বোধ থেকেই। গঙ্গা এবং সুধাদু -'জনেই বিষমকামী সম্পর্কে আবদ্ধ হতে চেয়েছিল। ওস্তাদ ঝাঁকসুর সাথে বিবাহের পরও গঙ্গা কিছুকাল এই সম্পর্কের মধ্যে ছিল। ওস্তাদ ঝাঁকসুও তখন বিষমকামী ছিল। অপরদিকে সনাতন ওস্তাদের প্রেমিকা সুধা প্রৌঢ় হেডপণ্ডিতের সঙ্গে বিয়ের আগেও এই বিষমকামী সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল সনাতনের সঙ্গে। অর্থাৎ সনাতন মাস্টারও কিছুকাল বিষমকামী সম্পর্কে লিপ্ত ছিল। কিন্তু পরে ওস্তাদ ঝাঁকসু ও সনাতন মাস্টারের বিষমকামী সম্পর্কে অনীহা দেখে প্রত্যাখ্যাত গঙ্গা ও সুধা আত্মহত্যা করতে চায়। গঙ্গা আত্মহত্যা করে বিষ খেয়ে। সুধা স্বামীর বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে চায় সনাতনের হাত ধরে। সনাতন জিনিষপত্র গুছিয়ে আনতে গিয়ে আর ফেরে না। তখন সনাতন মাস্টারের দলের নন্দ সঙ্গমের জন্য সুধাকে গলা টিপে হত্যা করে।এই দুই নারীর জীবন ছেড়ে ও সংসার ছেড়ে যাওয়ার মূলে রয়েছে দু'টি কারণ-

১।তারা স্বামীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় তৃপ্তি পায়নি। ২যে মানুষটির সঙ্গে তারা বিষমকা মী যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে চেয়েছে , তাদের কাছ থেকে সেভাবে সাড়া পায়নি।তাদের এই সাড়া না পাওয়ার কারণ ছিল একটি। তাদের বিপরীত ব্যক্তিদ্বয় তখন সমকামী সম্পর্কে লিপ্ত ছিল আপন আপন আলকাপ দলের ছোকরা শান্তি ও সুবর্ণর সঙ্গে। একথা জানতে ও বুঝতে পারার পর গঙ্গা ও সুধা দু'টি কাজ করেছিল।

১ গঙ্গা শান্তিচরণের যৌনতার পরীক্ষা নিয়েছিল। গঙ্গা মৃত্যুর আগে বা আত্মহত্যার আগে শান্তিচরণের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিল। শান্তি জৈবিক লিঙ্গে পুরুষ কিন্তু সামাজিক লিঙ্গে নারী। গঙ্গা তার সাথে অন্তরঙ্গতার সময় শান্তিকে জানিয়ে দিয়েছিল যে সে পুরুষ। শান্তির ভিতরের অবদমিত বিষমকামী যৌনতার বোধকে জাগিয়ে দিয়ে গঙ্গা তাকে বলেছিল, "দেখলাম, তুই আরও পাঁচটা পুরুষের মতো পুরুষ নাকি অন্য কেউ। !তুই তো খাঁটি পুরুষরে ছোঁড়া... রেখেছিস?"[১৩]শান্তিচরণ এই ঘটনার পর দল ছেড়ে চলে যায় লজ্জায়। আর সেইদিন গঙ্গার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে তার স্বামী সমকামী। এই সত্যটি জানার পর আত্মহত্যা করে গঙ্গামণি।

২, সুধা বিয়ের আগে থেকে পছন্দ করত সনাতনকে। গান শিখতে গিয়ে তাদের প্রথম আলাপ। বিয়ের পর আলকাপের গান শুনতে গিয়ে আবার তাদের দেখা। তারপর ধীরে ধীরে তাদের অন্তরঙ্গতা। এই অন্তরঙ্গতা সনাতনকে জানিয়ে দেয় যে সে সমকামী। নারীর প্রতি তার টান নেই। তার আকর্ষণ পুরুষের প্রতি।

"হঠাৎ সনাতন একটু অদ্ভুত ব্যাপার টের পেয়ে যায়। সুধা মেয়েতার দেহটা এত নরম-, তার ঠোঁট এত পাতলা, চুলে সুগন্ধ, হ্যাঁসুধা মেয়ে। তবু সনাতনের এমন কেন লাগে-? কই, কোথায় সে অমর্ত্য পুষ্পের ঘ্রাণ আনে না সে সুখ - মদের মতোঝাঁঝালো, তেতো অথচ আগুন জ্বালানো। সুবর্ণর দেহে একটা অমল কাঠিন্য আছে যা সিদ্ধ ধরনের... নরমতার একটি রূপ অথবা ভাব। সেই পেলব কাঠিন্যের স্বাদ অন্যরকম। সুধার সেগুলো কই? মন মন নিয়ে কী - করবে সনাতন? মনের অনেক জ্বালা।"[১৪]

এইভাবে মনহীন, শরীরসর্বস্ব একটা বিরল মায়ায় ডুবে থাকতে চায় সনাতন। কিন্তু ছোকরার যে মন নেই, এ কথা সনাতনের ভুল ধারণা। ছোকরা জৈবিক লিঙ্গে পুরুষ হলেও সামাজিক লিঙ্গে নারী। 'ইচ্ছায়, ভাবনায়, আহারে বিহারে- সে নারী।' নারীর অনুকরণ করতে করতে সে মনে মনে নারী হয়ে যায়। নারী যেমন তাকে হিংসে করে সতীন ভাবে, ছোকরাও তেমনি নারীকে সতীন ভাবতে থাকে। সে নারীর মতো করে পুরুষকে ভালোবাসতে চায়। পুরুষের ভালোবাসা, অন্তরঙ্গতা আশা করে। সে সম্পর্ক বা অন্তরঙ্গতা সমকামী হলেও সে আসলে বিষমকামী সম্পর্কেরই অনুকরণ করে। এক নিশুতি রাতে গভীর বিহ্বলতায় সুবর্ণ সনাতন মাস্টারকে বলতে শুরু করে- "সত্যি, আমার আজ এত ভালো লাগছে কেন বলুন তো মাস্টারমশাই? দেবার মতো কিছু থাকলে আজ তা সবটাই দিতে পারতাম।মেয়েরা এরকম বলে..., না, মাস্টারমশাই?... আমি আলকাপের ছোকরা, কাপের (নাটকের) মধ্যে বলে বলে কত মজার কথা না রপ্ত করেছি! তাই না! নিজেই বুঝতে পারি, এ আমার ময়নাপাখির বুলি। কিন্তু বলতে বলতে যেন সত্যি বলছি মনে হয়। মুখের কথা মনের কথা হয়ে যায়। যায় না...? ও মাস্টার, বলুন না, কোন মেয়ে আপনাকে কেমন করে ভালোবেসেছে কী বলেছে ! সে? বলবেন না? মাস্টারমশাই, ওগো!"[১৫]

সনাতন মাস্টার এ কথা না শুনে ঘুমিয়ে পড়ে সাড়া দিয়েছে নাক ডাকার মাধ্যমে। তার দলের ম্যানেজার আমির আলি এসব শুনতে পেয়ে ধমক দিয়েছে সুবর্ণকে। গাল দিয়েছে। বলেছে, "পন্ডিতের মাগ হয়েছে সুবন্ন। শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর- ...যানর ভ্যানর-বকর বকর্ভ"[১৬] সুবর্ণ আহত হয়েছে মনে মনে। নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, ম্যানেজার তাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। সুবর্ণ চেয়েছে সনাতন মাস্টারের ভালোবাসা। শেষপর্যন্ত সে তা পেয়েছে। শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছে তাদের সমকামী সম্পর্ক। ছোকরাদের নারীসঙ্গ করতে মানা। কালাচাঁদ যখন ছোকরা ছিল, তখন এক নারী তার কাছে শরীরী আবেদন নিয়ে আসে। কিন্তু তাতে সাড়া দিতে পারেনি কালাচাঁদ। মুকু ওস্তাদের সাবধানবাণী মনে পড়ে গিয়েছিল, "খবরদার বাছা, নারীপানে চেয়ো না, নারীসঙ্গ ছুঁয়ো নাসর্বনাশ হব-ে।"[১৭] বাইশ বছরের ছোকরার জীবনের এই অভিজ্ঞতা পঞ্চাশ বছর বয়সে স্মরণ করতে গিয়ে কোনও আক্ষেপ জাগে না মনে। কারণ ছোকরারা মনে মনেও মেয়ে হয়ে যায়। সুবর্ণকে যখন অজানা আবেগে খুব জোরে চেপে ধরে সনাতন মাস্টার তার ঘুমন্ত দু'টি ঠোঁটে চুমু খায়, অসম্ভব কোন অমর্ত ফুলের গন্ধে তন্ময় হয়ে যায়, তখন ভালো লাগে ছোকরা সুবর্ণর। কালাচাঁদ ছোকরা,

শান্তিচরণ ছোকরা, কানু ছোকরারও এ অভিজ্ঞতা আছে। তারা জানে, সনাতনরা রাতে কাছে আসে, চুমু খায়। সে কথা মনে করাতে গেলে চড় খায়। তবুও ছাড়তে পারে না প্রিয় পুরুষকে। তার সুন্দর ছবি এঁকেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে। সনাতন মাস্টার যখন সুধার জন্য দল ছেড়ে পালাতে চায় রাতের অন্ধকারে, তখন সুবর্ণ বাধা দেয়। ঔপন্যাসিক লিখেছেন, "পাগল হয়ে উঠেছে নাচিয়ে ছোকরাটা, এক অন্ধ আদিম জেদ কিংবা গভীরতম অদ্ভুত বিহ্বলতায় সে সনাতনকে আঁকড়ে ধরে মাথা কুটছে, না না না না, কিছুতেইনা।"[১৮] ছোকরার এই আবেগ শরীরের নয়, মনের। সে জানে, সে পুরুষ। কিন্তু মনে মনে সে নারী। একটা বয়স পর্যন্ত শরীরে তার মায়া। যৌবন ফুরালেই মায়া ফুরিয়ে যাবে। তাইত কালাচাঁদের উক্তি, -"আমি পুরুষ, না পুরুষ লই? যদি পুরুষ তবে আমার জন্য ক্যান জোড় দিলেন না বিধেতা? কী শাপে আমার এমন হলো গো? এখন আমার চুল পেকেছে, দাঁত ভেঙেছে, শরীল নড়বড় করছে তবু-তো সাধ মিটল না! এ সাধের অর্থ কী গো?... তারপর তো একদিন চুল কাটতে হল। খুলে ফেলতে হল চাঁদির চুড়ি। কঠোর পুরুষ হতে হল।... কী পাষাণ, হৃদয়হীন এ পৃথিবী!"[১৯]

ছোকরা নারী না, পুরুষ না, হিজড়েও না। নারী, পুরুষ বা হিজড়ে কেউ তাকে সমগোত্রীয় ভাবে না। এই তিন লিঙ্গের-কোনোটির সাথেই তার মিল নেই। শুধুমাত্র আলকাপ দলের প্রয়োজনে তাদের সৃষ্টি। যৌবন চলে গেলে তারা অকেজো। সারাটা জীবন জুড়ে শুধুই বঞ্চনা। পিতৃতান্ত্রিক বিষমকামী যৌন স্বাধীনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছোকরা সমকামী, কিন্তু যৌনতায় সে বিষমকামের প্রতিফলন তৈরি করে। তাই নারী বা পুরুষ কাউকেই মনের মতো করে কাছে পায় না। জীবনটা মনে হয় অভিশাপ, সাধ মেটে না এক জন্ম। পরজন্মের দিকে চেয়ে থাকে সে অভীষ্ট লাভের আশায়।
ছোকরা সুবর্ণকে নিয়ে দলের মধ্যে দলাদলি। আবার কখনও কখনও নারীরাও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। নারীদের আকৃষ্ট হওয়াটা ভালো লাগে না তার। বলে, "কাছে আসুক না, গলাটা টিপে দেব।"[২০] সনাতন প্রশ্ন করে, "কেন রে শালা? পুরুষ নোস?"[২১] সুবর্ণর খারাপ লাগে কথাটা শুনে। তার প্রত্যুত্তর, "গাল দিলেন!"[২২] সনাতন জানায়, গুরু হয়ে সে গাল দিতেই পারে। সুবর্ণর তাতে কোনও আপত্তি নেই, সে অধিকার গুরুর আছে। কিন্তু 'শালা' বলায় তার আপত্তি। সনাতন আবার বলে, "কী বলব? শালী বলব? তুই কি মাগী নাকি রে সুবর্ণ?"[২৩] সনাতনের এবারের প্রশ্ন আরও যন্ত্রণাদায়ক। প্রশ্ন তোলা হল তার নারীত্ব বা পুরুষত্ব নিয়ে? সনাতন বলতে চান, সুবর্ণ (ছোকরা) জৈবিক লিঙ্গে পুরুষ, তাই তার যৌনতা বিষমকামী হওয়া উচিত। নারীর প্রতি তার টান থাকা উচিত। কিন্তু সুবর্ণ (ছোকরা) নারীদের প্রতি কোনও টান অনুভব করে না বলে সনাতন তার লিঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। সুবর্ণ (ছোকরা) সামাজিক লিঙ্গে পুরুষ, তার পুরুষের প্রতি আকর্ষণ। সে সনাতনকে প্রশ্ন করেছে, "যান, যানঅত যদি ইয়ে !, তবে রাত্তিরে 'কিস' করলেন যে বড়? তখন বুঝি মনে ছিল না?"[২৪] সুবর্ণ এই প্রশ্নের মাধ্যমে সনাতনকে বুঝিয়ে দিতে চায়, সে জৈবিক লিঙ্গের পুরুষ বলে তার যদি নারীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করা উচিত হয়, তাহলে সনাতনও যেহেতু জৈবিক লিঙ্গে পুরুষ, তাই তারও পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করা উচিত নয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের এই বিষমকামী যৌনতা প্রথাগত। তাই সনাতন মাস্টারকে সমকামী হতে দেখে সুবর্ণ সনাতনের যৌনতাকেই প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়। সনাতন কি সমকামী? সনাতন ওস্তাদ সমকামী না হলে ছোকরাকে কেন চুমু খেল? ছোকরা কি ছেলে নয়? নাকি সনাতন মাস্টার ছোকরাকে নারী মনে করে? সনাতন মাস্টার যদি ছোকরাকে নারী মনে করে, ছোকরা যদি সামাজিক লিঙ্গে নারী হয়, তবে ছোকরার যৌনবোধও নারীর মতো হলে দোষ কী? সনাতন মাস্টার ছোকরাকে নারী ভেবে বিষমকামী হলে, ছোকরা নিজেকে নারী ভেবে বিষমকামী সম্পর্কে লিপ্ত হলে ক্ষতি কী? সনাতন মাস্টারের যৌনবোধ যখন প্রশ্নের মুখোমুখি, তখন সনাতন মাস্টার চড় মারে সুবর্ণকে। এ চড় আসলে সমকামিতার মুখে চড়। এ চড় আসলে পিতৃতন্ত্রের চড়। সনাতন সমকামী কি না, নিজেই টের পায় না। সে একবার সুধার কাছে যায়, একবার সুবর্ণর কাছে যায়। শেষপর্যন্ত সে সুবর্ণকে আশ্রয় করেই বাঁচতে চায়। 'সুবর্ণ আপনাকে ভালোবাসে'[২৫]আনিস একথা বলার পরই সনাতনের ঠোঁট কুঁচকে গিয়েছে ব্যঙ্গে- , ঘৃণায়। মন বিস্বাদে ভরে গিয়েছে তার। সে ভাবে, "সুবর্ণ যদি মেয়ে হতো, কোন মানে খুঁজে পাওয়া যেত এ কথার। একজন পুরুষ আর একজন পুরুষকে ভালোবাসে। বেশ তো, সেটার আসল নাম বন্ধুতা। সেটা সমবয়সী দু'জনের মধ্যে সম্ভব।

এখানে একজন ষোলসতেরো-, অন্যজন পঁচিশের মধ্যে। গুরু আর শাগরেদ। বন্ধুতা কদাচ সম্ভব নয়। একজনের শ্রদ্ধা, অন্যজনের স্নেহ। তা নয়, ভালোবাসাস্রেফ নির্ভেজাল ভালোবাসা! কী মানে হয় এর !?"[২৬]

সনাতন গুরুত্ব দিতে চায় না কথাটার। তবু গুরুত্ব দিতে হয়। কথাটি যে শুধু আনিস বলেছে, তেমন নয়। সুবর্ণও চিঠিতে লিখেছিল কথাটা। সনাতনের পছন্দ নয় এ কথা। তার খারাপ লাগে। এ উপলব্ধি শুধু তার একার নয়। ওস্তাদ ঝাঁকসুরও একই অভিমত। তার ওস্তাদ মনিরুদ্দিন বিশ্বাস বলেছিলেন,"পুরুষকে নারী সাজিয়ে লক্ষ মানুষের মনে নেশা ধরিয়েছি,-নিজেও মজেছি সে নেশার ঘোরেএ পাপ মহাপাপ। অনন্ত জাহান্নাম সামনে জ্বলে। গায়ে আঁচ লাগে।-..."[২৭] বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন লেখক স্বয়ং। "আলকাপেরা টের পায় ও কী জ্বালা খুব কাছেই যে বিশাল আগুন। ! ফোস্কা পড়েতাপে। অধরাকে যত ধরতে চায়-, দেখে রক্ত মাংসের ক্লেদ, ব্যর্থতার গ্লানি। প্রতিমার গায়ে লোভের পাপী হাত আঁচড় কাটতেই বেরিয়ে পড়ে খড় আর বাঁশের পিণ্ড। ইষ্টদেবতা তো ওখানে নেই তার বাস মনের মধ্যে। তাকে-হাতের মুঠোয় পেতে গিয়েই আঁচ লাগে। মোহ ভেঙে যা পড়ে থাকবে, তা অশ্লীল। তার নাম সমকামিতা।'"[২৮]

ছোকরার শরীর দেখে মোহে পড়ে পুরুষেরা, তারপর মোহভঙ্গ হতেই জানতে পারে, সে নারী নয়, পুরুষ। কিন্তু ননী ডাক্তার বুঝতে পারেনি যে শান্তি শরীরে নারী নয়। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ননীবাবু শান্তিকে বলেছিল, "সাক্ষাৎ কিন্নর হে তুমি।চুল কাটবে..., চুড়ি ভাঙবে, পুরুষ হবে? হয়তো হবে, কিন্তু স্মৃতির জ্বালা বড় জ্বালা। সে ব্যাটা বাঘের মত চিবিয়ে খাবে, দেখে নিও। তুই ব্যাটা ধরাধামে অ-ধরা। খুব...লাবি।মরবে..., জ্বলে পুড়ে মরবে। নিজে মরবে, অন্যকেও মারবে।"[২৯] আলকাপের ছোকরাদের সম্পর্কে এমন কথাই বলে সাধারণ মানুষেরা। তারা শুধু ছোকরার শরীর নিয়ে ভাবে, মন নিয়ে নয়। দেখা যাক, ছোকরা কী ভাবে তার অস্তিত্ব নিয়ে। সুবর্ণ কাদুকে বলেছিল, "আমি তো মেয়ে নই। আমার দশায় পড়লে মেয়েরা গলায় দড়ি দিয়ে মরত। কী করে বোঝাব, আমি কী?"[৩০] নারী বা পুরুষের প্রথাগত ছাঁচে সীমাবদ্ধ না থাকায় ছোকরাদের জীবনে ঘটে চলে নানা হিংসা, অধিকার হনন। রাতে দলের অন্য পুরুষ তাদের টানে। আবার কখনও নারী মনে করে মাতালেরা তাদের তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণও করে। যেহেতু তারা নারী নয়, তাই এই ধর্ষণ তেমন গুরুত্ব পায় না। কালাখুড়ো ভুলতে পারে না ছোকরা জীবনের স্মৃতি। "পিছনের নটির স্মৃতি ওকে উত্যক্ত করে।সে খোঁজে তার বয়সের অতল জলে হারানো কোন এক মোহিনী প্রতিবাস-সে নারী-কিংবা নারী নয়..., পুরুষ তবু পুরুষ নয়বিরল মায়া।-"[৩১] সুবর্ণ মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে যায়। "মাঝে মাঝে তার মনেই থাকে না যে সে পুরুষ, সতেরো বছরের কিশোর। সব বদলাবে, তার এই মনসাত বছর ধরে তৈরি মনটা কি বদলাবে কোনদিন-?"[৩২] তাদের মনটা নারীর। শরীর পুরুষের। কিন্তু বেশভুষা নারীর। সুধাকে সুবর্ণ জানায়,"মেয়ে নই, মেয়ের মতো থাকি। পুরুষ মানুষের কত কী বুঝতে পারি। আমায় সবাই মেয়ে বলে ধরে নেয় কি না।"[৩৩]

সুবর্ণর এ কথা সত্যি। শরীরে পুরুষ বলে পুরুষের অনেক শরীরী ইঙ্গিত সে সহজে বোঝে। পুরুষের শিকারও তাদের হতে হয় নারীর মত করেই। যৌন হেনস্থাও এর মধ্যে পড়ে। তারা জানে তাদের ভবিতব্য। তাই সনাতন মাস্টারকে সুবর্ণ কাঁদতে কাঁদতে সহজেই বলে, "কাঁদব কেন? কে দেখবে আমার কান্না? কদিন পরে চুল কাটতে হবে, চুড়ি ভাঙতে হবে, গলা যাবে নষ্ট হয়ে, তখনই তো কাঁদবার দিন শুরু!"[৩৪] ছোকরা জানে, শিল্পের প্রয়োজনেই তার সৃষ্টি। যতদিন তার শিল্পীসত্তা আছে, ততদিনই তার মূল্য। শিল্পীর বয়স ফুরালে শিল্পে তার আর ঠাঁই হবে না। মানুষ ছোকরার অস্তিত্ব সেখানে বিপন্ন। তবুও ছোকরা লড়াই করে যায় তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। লিঙ্গ পরিচয়ের উর্দ্ধে উঠে তার শিল্পীমন চায় আর একজন শিল্পীর আশ্রয়, সাহচর্য। তাই উপন্যাসের শেষে সনাতন মাস্টারের হাত ধরে নতুন পালা বাঁধবার স্বপ্ন দেখে সুবর্ণ, ঘর বাঁধবার নয়। "অনেক গান আর মায়া ভরা একটা জগতের দিকে হেঁটে যেতে যেতে দু'টি মানুষ একসঙ্গে গুনগুন করে গেয়ে ওঠে, কী আনন্দ দেখ গো নভে নবীন চাঁদের উদয়। মায়ায় মায়ায় যাক না জন্ম, যদি আরেকজন্ম সত্যি হয়। গাইতে গাইতে একটা হাত আরেকটা হাত ধরে রাখে। একটা শরীর আরেকটা শরীরকে ছোঁয়। ফের কে গর্জে ওঠে, হুঁশিয়ার। পিছনে জাহান্নাম। মনে মনে চমকে ওঠে সোনা ওস্তাদ। তবু সেই হাতটা ছাড়ে

না। সুবর্ণকে ছুঁয়ে থেকে একটা নতুন পালা বাঁধবার সাধ হয়। মেয়েদের মত দীঘল কেশ, দু'হাতে চাঁদির চুড়ি, নীলচে শার্ট আর পাজামা, পায়ে কাবুলি চপ্পল, ফরসা মুখের চাপা চিবুক, মসৃণ নিটোল গাল, টানা চোখ, পুরুষ তবু পুরুষ নয়, নারীঅথচ নারীও না-, সে কিম্পুরুষও নয়-সে এক অমর্ত্য মায়া। তাকে নিয়েই দেশে দেশে মৃদঙ্গ বাজে।"[৩৫] সৈয়দ মুজতবা সিরাজ বলেছেন, ছোকরার এই ভালোবাসা "চণ্ডীদাসী প্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।"[৩৬] তবুও শরীর শরীরকে ছোঁয়, সাবধানতা জারি করে সমাজ। সমকামকে তারা জাহান্নামের সঙ্গে তুলনা করে। তবুও সুবর্ণ আর সনাতন 'হাতটা ছাড়ে না'। নানারী-,পুরুষ-, না কিম্পুরুষদের নিয়ে রসিকতার শেষ নেই। তবু আলকাপে তাদের ছাড়া চলে না। তাদের বাদ দিলে 'বিরল মায়া' সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয় এই শিল্প। মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বলেছেন,"পৃথিবীর আর কোথাও 'আলকাপ'-এর ওই 'মায়া'র মতো মায়া নেই।"[৩৭] সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখক আরও বলেছেন, "মায়া বলে একটা কথা আছে। আসলে এই যে ইলিউশন, পুরুষ নয়, নারী নয়, হিজড়েও না।"[৩৮] এই মায়ার প্রেমে লেখক নিজেও পড়েছিলেন। বিশ্বজিৎ পান্ডা তার "যৌনতা ও বাংলা সাহিত্যের পালাবদল" বইয়ে লিখেছেন,"মায়া নারীর প্রেমে শুধু সাধারণ পুরুষরাই পাগল হচ্ছে না, শিল্পীরাও তার প্রেমে পড়েছেন জেনেবুঝেই। মায়া নারী শিল্পের নারী। শিল্পের নারীর প্রেমে পড়েছেন শিল্পী নিজেই। এ প্রেম আবার ... কল্পনার প্রেম নয়, শরীরেরও।"[৩৯] সেই শরীরের প্রেম কখনো কখনো অত্যাচারী হয়ে উঠেছে। মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "এই ছোকরারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হয়ে ওঠে পুরুষদের ভোগের সামগ্রী। খুব প্রচ্ছন্নভাবে তিনি দেখিয়েছেন, এরা যৌন নিপীড়নের শিকার কীভাবে হয়।"[৪০] যৌন হিংসা, অধিকার হননের চিত্রও এ উপন্যাসকে অন্য এক মাত্রা দিয়েছে। যা অভিনব ও অভাবনীয়।

তথ্যসূত্র:

১। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, "মায়ামৃদঙ্গ", "প্রথম সংস্করণের ভুমিকা", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, মার্চ ২০১৬।
২। তদেব।
৩। "মায়ামৃদঙ্গ", "দ্বিতীয় সংস্করণের ভুমিকা" ।
৪। তদেব।
৫। তদেব।
৬। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, "মায়ামৃদঙ্গ", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, মার্চ ২০১৬। পৃ- ১১।
৭। তদেব, পৃ-১৬।
৮। তদেব, পৃ- ১৪।
৯। তদেব, পৃ- ১২২।
১০। তদেব,পৃ- ১৬।
১১। তদেব,পৃ- ৭৮, ৭৯।
১২। তদেব, পৃ- ৬১।
১৩। তদেব,পৃ- ১২১।
১৪। তদেব, পৃ- ১২৯।
১৫। তদেব, পৃ- ৬২।
১৬। তদেব।
১৭। তদেব, পৃ- ১২৮।
১৮। তদেব, পৃ- ১৩৮।
১৯। তদেব, পৃ- ১২৮।

২০। তদেব, পৃ- ৯২।
২১। তদেব।
২২। তদেব।
২৩। তদেব ।
২৪। তদেব, পৃ- ৯২।
২৫। তদেব, পৃ- ৬৫।
২৬। তদেব।
২৭। তদেব, পৃ-৩২।
২৮। তদেব।
২৯। তদেব, পৃ- ১২।
৩০। তদেব , পৃ- ৬০।
৩১। তদেব, পৃ- ৬১।
৩২। তদেব।
৩৩। তদেব, পৃ- ৯০।
৩৪। তদেব , পৃ- ৯৩।
৩৫। তদেব , পৃ- ১৪৪।
৩৬। তদেব, পৃ- ৬৫।
৩৭। মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে ভিন্নতর প্রান্তিক সত্তা চিহ্ন", প্রতিভাস-কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২, পৃ-১৪৮।
৩৮। বিশ্বজিৎ পাণ্ডা, "যৌনতা ও বাংলা সাহিত্যের পালাবদল", পরশপাথর প্রকাশন, কলকাতা, ১৪২২, পৃ-১০৪।
৩৯। তদেব।
৪০। মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে ভিন্নতর প্রান্তিক সত্তা চিহ্ন", প্রতিভাস-কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২, পৃ-১৪২।